

মনজুরে মওলা

# রাষ্ট্রদূতও নিরাপদ নন

এ কথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক সাধক পুরুষ যেখানে সমাহিত আছেন, সেখানে কিছুদিন আগে বোমা বিস্ফোরণের যে ঘটনাটি ঘটল, তার উদ্দেশ্য ছিল এ দেশে নিযুক্ত একজন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা। ঘটনাটি আকস্মিকভাবে ঘটেনি, কিংবা, ওই রাষ্ট্রদূত আকস্মিকভাবে বোমা-হামলার ঘটনার শিকার হননি। বোমাটি তাঁকে লক্ষ্য করেই ছোড়া হয়েছিল, তাঁর গায়ে আঘাত করেছিল, আঘাত করার পর ছিটকে পড়েছিল, এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং এগিয়ে যাবার ফলেই নিহত হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। এ বেঁচে যাওয়াটা বিশ্ময়কর। পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতের কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। ওই রাষ্ট্রদূত নিহত হতে পারতেন এবং যদি তিনি তা হতেন, তাহলে এ ঘটনা আরও তীব্র আকার ধারণ করত। কিন্তু এ ঘটনার মূল তাৎপর্য এখন যা আছে, তখনও তা-ই থাকত। এ তাৎপর্য এই যে, আমরা একজন রাষ্ট্রদূতের–যিনি এ দেশে একজন সম্মানিত অতিথি–নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারিনি। এ তাৎপর্য এই যে, এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ওই একই জায়গায় ঘটার পরেও আমরা সাবধান হইনি বা সাবধান হবার প্রয়োজনবোধ করিনি। এ তাৎপর্য এই যে, সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটাতে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদের দমন করতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ তাৎপর্য এই যে, এ দেশে এখন কেউই নিরাপদ নয়। ওই রাষ্ট্রদূতকে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তারপর অতি দ্রুত তাঁকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং কিছুটা সুস্থ হবার পর তিনি চিকিৎসার জন্য তাঁর নিজ দেশে ফিরে গেছেন। ওই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এই রাষ্ট্রদূত মাত্র কিছুদিন আগে এ দেশে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আসলে এ দেশেরই মানুষ, এ দেশেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। পরে তিনি অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং সে দেশের প্রতিনিধি হিসাবে এ দেশে আসেন। এমনি ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। তাঁর নিয়োগের দিক থেকে ওই রাষ্ট্রদূত তাই ব্যতিক্রমী ছিলেন। সন্ত্রাসীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি আবারও ব্যতিক্রমী হয়ে গেলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাঁর দেশ বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এটি কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে ওই দেশের দীর্ঘদিনের ধারণা এই ঘটনার পর মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং, যদি তা হয়, তাহলে তার মূল্য বাংলাদেশকেই দিতে হবে। ওই রাষ্ট্রদূতকে লক্ষ্য করে যা ছোড়া হয়েছিল, সাধারণ ভাষায় তাকে বোমা বলা হলেও আসলে তা ছিল গ্রেনেড। গ্রেনেড বলেই এটি বিস্ফোরিত হতে কয়েক সেকেভ সময় লেগেছিল। গ্রেনেড এমনভাবেই বানানো হয় যে, বিস্ফোরিত হতে এই সময়টুকু যেন লেগে যায়, যে গ্রেনেডটি ছুড়ছে, সে যেন নিরাপদ থাকে। সাধারণ বোমা আর গ্রেনেড এক কথা নয়। যে বা যারা এ গ্রেনেডটি ছুড়েছে, সে বা তারা এটি পেল কোথায়? গ্রেনেড সমরাস্ত্র। সাধারণভাবে এটি পাওয়া কিংবা ঘরে বসে এটি বানানো সম্ভবপর নয়। স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যারা এটি ছুড়েছে, তাদের সঙ্গে কোন জঙ্গী সংগঠনের সম্পর্ক আছে বা কোন এক সময় ছিল। বিদেশে এ ধরনের জঙ্গী সংগঠন তো আছেই। তারা তাদের কার্যক্রম গোপন করে না এবং সে-কার্যক্রমের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এ ধরনের কোন সংগঠনই কি এ ঘটনা ঘটিয়েছে? কিন্তু, কেন? ওই সব বিদেশী সংগঠনের বাংলাদেশে সক্রিয় হবার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এটি যদি না হয়, তাহলে ধারণা করতে হবে যে, এ দেশেই জঙ্গী সংগঠন আছে। সে সংগঠনের কাছে অস্ত্র আছে এবং সে সংগঠনের সদস্যরা এসব অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সরকার তাহলে কি করছে? এ ধরনের সংগঠন দেশে থাকে কি করে? যদি থাকে, সরকার তার খোঁজ পায় না কেন? যদি পায়, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না কেন? বাংলাদেশ কি তাহলে এক ধরনের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছে কিংবা হতে যাচ্ছে? এই যে মাঝেমধ্যে অবৈধ অস্ত্রের বিপুল চালান ধরা পড়ে, সেগুলো যায় কোথায়? কে বা কারা আনে? যারাই আনুক, তারা ধরা পড়ে না কেন? এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পুক্ত নয়, এমন একটি বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে। সেটি হলো সাম্প্রতিককালে দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি মৌলবাদী সংগঠনের তৎপরতা। এই সংগঠনটি তার অপছন্দের লোকজনকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে এবং প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করে তার দম্ভ প্রকাশ করছে। সরকার-প্রধান নাকি এ সংগঠনের নেতাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে-নির্দেশ এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। হতে পারে ওই সংগঠন যাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তারা খুবই মন্দ লোক। তার পরেও তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার কোন অধিকার ওই সংগঠনের নেই। এই ধরনের কোন সংগঠন যদি দেশে অপ্রতিহতভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে অন্য সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহও উৎসাহিত বোধ করবে। যে পরিস্থিতিতে দেশে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভবপর বলে মনে করা যায়, সে পরিস্থিতি, দুর্ভাগ্যবশত, দেশে বিরাজ করছে না। এ কারণেই কি ওই রাষ্ট্রদূতের ওপর হামলা সম্ভবপর হয়েছে? একটি আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ওই বাহিনী ওই রাষ্ট্রদূতের কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এটি কি করে সম্ভব? যখনই কোন রাষ্ট্রদূত রাজধানীর বাইরে কোথাও যান, তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সে বিষয়ে অবহিত করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ওই রাষ্ট্রদূতের কর্মসূচীর কথা জানিয়ে দেয়। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হয়ে পড়ে রাজধানীর বাইরে ওই রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা বিধান করা। বর্তমান ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। তাহলে ওই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি করে বলে যে, ওই বাহিনী ওই রাষ্ট্রদূতের কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত ছিল না? নাকি, ওই বাহিনী এই কর্মসূচীর কথা জানত ঠিকই, কিন্তু তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি? ওই ঘটনার পর-পরই কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা প্রধান বিরোধী দলের কর্মী বা সমর্থক। কোথাও কোন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলেই প্রধান বিরোধী দলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যেন প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। এমনটি হলে সুষ্ঠু তদন্ত আশা করা যায় না। এ দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রকৃত অপরাধী ধরার আগে রাজনৈতিক লিঙ্ক খোঁজার কোন দরকার নেই। সত্যিকারের অপরাধীকে গ্রেফতার করুন' ('জনকণ্ঠ', ২৪-০৫-২০০৪)। এর মানে কি এই যে, আগে প্রকৃত অপরাধী ধরার আগে 'রাজনৈতিক লিক্ক' খুঁজে দেখা হতো? এ অবস্থার নিরসন যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল।

# আসন্ন বাজেট

### বিদেশ নির্ভরতা না আত্মনির্ভরশীলতা?

আতিউর রহমান আর কয়েকদিনের মধ্যেই সামনের অর্থবছরের জন্য সংসদে বাজেট পেশ করবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী, এনজিও, অর্থনীতিবিদ, সংসদ সদস্য ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে সংলাপ করে চলেছেন। উনুয়ন ভাবনায় বিভিন্ন মহলের মতামত নেবার এই সংস্কৃতিটি ধীরে ধীরে হলেও দানা বাঁধছে। আগের সরকারের আমলে শুরু হলেও প্রাক-বাজেট আলোচনার এই উদ্যোগটি যে বর্তমান সরকারের আমলেও চালু রাখা হয়েছে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। নীতির ক্ষেত্রেও এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেলে আরও ভাল হতো। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, সরকারী ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মুখ দেখাদেখিই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সে কারণে সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে। দেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়নের সময়েও বিরোধী দলের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে না। এমন ইস্যুতেও জাতীয় ঐকমত্য নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এবারের বাজেট হবার কথা পিআরএসপি ভিত্তিক। সত্যিই কী তা হচ্ছে? এমন পরিবেশে সুশাসন, উনুয়নের স্বদেশায়ন এবং জাতীয় নীতিকৌশল গ্রহণের মতো কথাবার্তা খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকই মনে হতে পারে। তারপরেও নাগরিক সামাজের পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলো দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। সমাজ ও রাজনীতিতে যে অস্থিরতা এবং রক্তক্ষরণ চলছে তাতে দেশবাসী সত্যি উদ্বিগ্ন। সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটি দেশ শুধুমাত্র শক্তিশালী, সুবিবেচক, দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের অভাবে কী করে হতাশায় নিমজ্জিত হতে পারে বাংলাদেশ তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হতে পারে। আশপাশের দেশ যখন নিজেদের সকল দুর্বলতা সুশাসন নিশ্চিত করার পথে দৃঢ়চিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা প্রতিহিংসা, দুর্নীতি এবং সহিংসতার রেকর্ড করে যাচ্ছি। আর সে কারণে, বিদেশীরা সুযোগ পেয়ে আমাদের সর্বক্ষণ শলাপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে আমরা বারে বারে তাদের কাছেই আমাদের দৈন্য প্রকাশ করে যাচ্ছি। উনুয়নের জন্যে নিঃসন্দেহে বিদেশী সাহায্য প্রয়োজন। তাই বলে যে কোন শর্তে, যে কোন মূল্যে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের জন্যে মরিয়া হবার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। আমাদের দেশটাকে যদি আমরা চিনে থাকি তাহলে স্বদেশের জন্যে স্বাধীন শক্তিতে কাজ করবার মতো মানুষের অভাব নেই। তারা নানাভাবে নানাক্ষেত্রে স্বদেশের উনুয়নে কাজও করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের এই সূজনশীল প্রচেষ্টাসমূহকে যথার্থ মদদ দেবার মতো সহায়ক নীতি পরিবেশ আমাদের নীতিনির্ধারকরা তৈরি করে দিতে পারছেন না। নিজেদের ওপর ভরসা রেখে স্বদেশের কৃষক, শ্রমিক এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্যে সহায়ক অবকাঠামো এবং নীতি সমর্থন দেবার মতো সাহস তারা দেখাতে পারছেন না। তারা বিদেশীদের কথামতো লাভজনক পাবলিক শিল্পকেও ব্যক্তিখাতে দিতে বেশি আগ্রহী, কৃষককে কম দামে বিদ্যুত দিতে কম আগ্রহী, হতদরিদ্রকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে অনুৎসাহী। তাই সংস্কারের নামে তারা বেকারত্ব বৃদ্ধি করেন, দারিদ্যের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। অথচ আমরা যদি নিজের মতো করে নিজের দেশটার উনুয়নের চেষ্টা করতাম তাহলে এমন বিভূম্বনায় পড়তে হতো না। ভারতের নির্বাচনের ফলাফল দেখেও আমরা এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় না। স্বদেশের প্রয়োজনে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করাই যে একটি বড় লাভ সে কথাটি কী আমরা বুঝি? "দেশের জন্য স্বাধীন শক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি তাহাতে দুই দিকে লাভ–একে তো ফল লাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফল লাভের চেয়ে বেশি বৈ কম নয়" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯)। রবীন্দ্রনাথের এই দেশজ চিন্তা আমাদের উনুয়ন কৌশল উদ্ভাবনে বিরাট শক্তি যোগাতে পারে। এ কথাগুলো বেশি করে মনে পড়ছে সম্প্রতি শেষ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভার পর। পাঠকরা নিশ্চয় জানেন যে, কিছুদিন আগে ঢাকায় বাংলাদেশ উনুয়ন ফোরামের এক সভা হয়ে গেল। সেই সভায় দাতারা বাংলাদেশ সরকারের ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারের খানিকটা প্রশংসা করলেও দেশ পরিচালনার নানা বিষয়ে তাদের তীব্র সমালোচনাও শুনতে হয়েছে আমাদের নীতিনির্ধারকদের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বেহাল অবস্থা, দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা এবং এনজিওদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিষয়ে প্রচুর কথাবার্তা শুনতে হয়েছে সরকারকে। একাধিক মন্ত্রীকে দাতা প্রতিনিধিদের সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে সরকারের চলমান নীতি-কৌশল নিয়ে জবাবদিহি করতে হয়েছে তাতে একজন নাগরিক হিসাবে আমার কান ঠিকই লাল হয়ে উঠেছিল। 'গলায় গামছা ঝুলিয়ে এভাবে বিদেশীদের সামনে যদি আমাদের নীতিনির্ধারকদের নতজানু হতে হয় তাহলে স্বাধীন দেশের মর্যাদা আর থাকল কতটুকু। যে কোন মূল্যে বিদেশী সাহায্য পাবার জন্যে মরিয়া হবার কারণেই বিদেশীরা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এভাবে প্রশ্ন করার সাহস পেয়েছে। বিদেশী সাহায্য নিই বলেই এমন করে আমাদের কথা শুনতে হচ্ছে। তবে আমরা যদি আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করতাম তাহলে নিশ্চয় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। অথচ টাকার অংকে এখন কিন্তু খুব বেশি বিদেশী সাহায্য পাই না আমরা। এক দশক আগেও আমরা আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশের মতো বিদেশী সাহায্য পেতাম। এখন তা কমে আড়াই বা তিন শতাংশের মতো হয়েছে। এই অংক আমরা যে পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করি তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম। আমাদের অনাবাসী শ্রমিকরা যে পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠান তার অর্ধেকের মতো এই অংক। এর দ্বিগুণেরও বেশি আমরা রপ্তানী আয় করে থাকি। এই সামান্য বিদেশী সাহায্যের জন্য কেন আমাদের এতো পরামর্শ বা চোখ রাঙ্চানি শুনতে বা দেখতে হবে। যে পরিমাণ বিদেশী সাহায্য আমরা পাই তা কী আমাদের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারি? ওই অর্থ দিয়ে কি আমরা আমাদের পছন্দমতো দেশ থেকে যন্ত্রপাতি বা পণ্য কিনতে পারি? তা যদি না পারি তাহলে এতোটা মরিয়া হয়ে বিদেশী সাহায্য নেবার কী প্রয়োজন সত্যি সত্যি রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব একটা সহজ হবে না। জাতি হিসাবে আমরা যদি নিজের পায়ে আত্মসম্মান নিয়ে দাঁড়াতে না চাই, নিজেদের পকেট থেকে কর দিয়ে দেশের উন্নতি করতে আগ্রহী না হই, বিদেশী সাহায্য-নির্ভর প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত গাড়ি, এসি ব্যবহার থেকে বিরত না থাকতে চাই, এসব প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাড়তি কমিশনের

লোভ সংবরণ না করতে পারি তাহলে এমন করে বছর বছর আমাদের দাতাদের সামনে জবাবদিহি করে যেতেই হবে। এর মানে এই নয় যে, আমি বিদেশী সাহায্যের পুরোপুরি বিরোধী। নিশ্চয়

আমরা কম সুদের আইডিএ ঋণ নেব। তবে তা নেব আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও প্রয়োজনমাফিক। যে বিদেশী সাহায্য নিলে আমাদের অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বাড়বে, মানব সম্পদের উনুতি হবে তা নিশ্চয় আমরা নেব। তবে সেজন্যে অপমানজনক শর্ত মানতে আমি রাজি নই। বিদেশী সাহায্য না নিলেও যেখানে আমাদের চলবে সেখানে অন্যায্য সব শর্তে পরনির্ভরতার শেকল পরার কোন মানে হয় না। একটা সময় ছিল যখন সত্যি সত্যি আমরা আমাদের জনগণকে দু'বেলা খাবার দিতে পারতাম না। তখন বিদেশী খাদ্য সাহায্য না পেলে দুর্ভিক্ষ ছিল অনিবার্য। কিছু আমাদের পরিশ্রমী কৃষকরা আমাদের এই অসহায়ত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। তারা গত তিরিশ বছরে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে আমাদের খাদ্য সাহায্য নির্ভরতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি দিয়েছেন। আর এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও খাদ্য আমদানি খুব বেশি পরিমাণে করতে হয় না বলে আমাদের বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভেও সেভাবে টান পড়ে না। উপরস্তু তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে কাজ করে। প্রচুর রেমিটেস পাঠাছেন এবং দেশের গার্মেন্টস খাতে কাজ করে। প্রচুর রফতানি আয় নিশ্চিত করছেন। আমাদের কৃষকদের এই অবদানের কারণেই আজ আমরা উনুয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অনেকাংশেই এগিয়ে রয়েছি। তা সত্ত্বেও আমাদের নেতৃত্বের অদক্ষতা ও অসততার কারণে দেশে দুর্নীতির বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং সন্ত্রাস এক শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীন শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে পারিনি বলেই দেশে শাসন ব্যবস্থায় তাব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আর সে কারণেই দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের চাপ ও তাপ সমাজকে ছিনুভিন্ন করে ফেলছে। আর সে কারণেই, আমাদের দেশ পরিচালকরা যে কোন মূল্যে বিদেশী সাহায্য পেতে আগ্রহী। কেননা, উনুয়ন বাজেট তৈরিতে লাগে বিদেশী সাহায্য। আর উনুয়ন বাজেটটিই আমাদের অর্থনীতির 'নরম পেট' (সফ্ট বেলি) অন্য কথায় তা এক 'কালো গহরর; দুর্নীতির বড় আখড়া।

দাতাদের কথা যতই অপছন্দ করি না কেন এ কথাও তো ঠিক যে সর্বগ্রাসী এই দুর্নীতি বন্ধ করা গেলে এবং দেশে ন্যায্য শাসন নিশ্চিত করে সামাজিক শান্তি আনা গেলে আমাদের জাতীয় আয় বছরে আরও তিন শতাংশের মতো বাড়ানো সম্ভব। এমনিতেও আমরা প্রবৃদ্ধির দৌড়ে খুব একটা খারাপ করছি না। কিছু বর্তমানের সাড়ে পাঁচ শতাংশ হারের সঙ্গে আরও তিন কিংবা আড়াই শতাংশ যোগ হলে জিডিপি বৃদ্ধির হার সহজেই আট শতাংশ নিশ্চিত করা সম্ভব। দাতারা এবারের উন্নয়ন ফোরামের সভায় নীতি নির্ধারকদের এই সম্ভাবনার কথাটি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। আর এই হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা গোলে আমাদের দারিদ্রা নিরসনের লক্ষ্য পূরণ সহজ হবে। এই পথে এগুলে প্রতিবছর দুই বিলিয়ন ডলারের সমান বিদেশী সাহায্য পেতেও অসুবিধা হবে না বলে দাতারা জানিয়েছেন। অরশ্যি, শুধুমাত্র বিদেশী সাহায্য পাব বলেই আমরা এই পথে হাঁটব এমন করে বলার মধ্যেও এক ধরনের হীনম্মন্যতা প্রকাশ পায়। কেন আমরা আমাদের প্রয়োজনেই দারিদ্রের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় লড়াই শুরু করতে পারব না? দলমত নির্বিশেষে দারিদ্র্য নামের যমদূতের বিরুদ্ধে যদি একটি সর্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু না করতে পারি তাহলে গরিব দেশের যে তিলক আমরা পড়ে বসে আছি তা মুছে ফেলা সহজ হবে না। দারিদ্র্য যেহেতু একটি বহুমাত্রিক বিষয়, তাই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধরনও হতে হবে বহুদিক থেকে। অনেকটাই গেরিলা যুদ্ধের মতো। সাধারণের আয় রোজগার বাড়ানোর মতো আর্থ-সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রকে কতগুলো ক্ষেত্রে মৌলিক দায়িত্ব নিতে হবে। সামাজিক শান্তির জন্যে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকেই। সেজন্য আইনান্য প্রভৃত রাষ্ট্রের। সেক্ষেত্রে একা না পারলে রাষ্ট্রকে এনজিও কিংবা ব্যক্তিখাতকে সহযোগী হিসাবে নিতে হবে। তাছাড়া, জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ মানুষের এখনও চালচুলো দুটোই নেই। নেই তাদের কোন ঠিকানা। অন্যের দয়া-দান্ধিণ্যে তারা কোনো মতে বেঁচে আছে। মানুষের মানবেতর জীবন পরিচালনার ক্লেশ থেকে মুক্তি দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

এমন কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা বর্তমানে জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র তৈরি করার কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এর আগে দাতাদের চাপেই আমরা একটি অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র তৈরি করেছিলাম। সেই পত্রটি খুবই তাড়াহুড়ো করে তৈরি করেছিলাম বলে তাতে অনেক দুর্বলতা ছিল। যাদের জন্য এই কৌশলপত্র সেই গরিব মানুষের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে আলাপ করে তৈরি করতে পারিনি। খুবই আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই খসড়া পত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এতে সেইভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়নি। এ বিষয়ে সরকারী এবং বিরোধী রাজনীতিকদের সচেতনভাবে অংশগ্রহণের চিত্র আমাদের চোখে পড়েনি। দেশের সংসদে এ বিষয়ে গভীর কোন বিশ্লেষণ হয়নি। এমনকি মন্ত্রিপরিষদেও এ বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে বলে আমরা জানি না। পার্লামেন্টারি স্থায়ী কমিটিগুলোতেও প্রতিটি খাতওয়ারী আলাপের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এ প্রশ্নে মিডিয়া বিতর্কও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। একটিমাত্র এনজিওর মাধ্যমে আমন্ত্রণ করে অংশগ্রহণের যে সাজানো অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে জনগণের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে যে কৌশলপত্রে তার ওপর মতামত দেবার অধিকার গরিব মানুষসহ সকল নাগরিকের রয়েছে। সেই অধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেননি খসড়া কৌশলপত্র প্রণেতারা। পত্রিকার মাধ্যমে তাদের মতামত চাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেননি কৌশল প্রণেতারা। তাছাড়া, কনসালটেশনের সংখ্যাও ছিল সীমিত। পেশা বা লিঙ্গের ভিত্তিতে নানা ধাঁচের গরিবদের মতামত নেবার যে সুযোগ ছিল তাও গ্রহণ করেননি কৌশলপত্র প্রণেতারা। তাছাড়া, সীমিত আকারে হলেও কী তাঁরা আলাপ করেছেন সে কথা দেশবাসী জানেন না। এমনকি কীভাবে অংশগ্রহণকারীদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে বিষয়টিও পুনরায় তাদের কাছে গিয়ে জানাননি কৌশলপত্র প্রণেতারা। ফলে. যে কথাগুলো খসডা কৌশলপত্রে স্থান পেয়েছে সেগুলো কার কথা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এই সব দুর্বলতার আলোকেই আমরা আশা করেছিলাম যে খসড়াপত্রটি যখন চূড়ান্ত করা হবে তখন যেন জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তা করা হয়। আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তাই প্রস্তাব করেছি যে, ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যেন পিআরএসপি টাঙ্কফোর্স/স্টিয়ারিং কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন করা হয়। সরকার যেন পিআরএসপি প্রস্তুতি পর্বে সহায়কের ভূমিকায় থাকে। তারা যেন তাদের কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে জনগণের অংশগ্রহণের স্বতঃস্কুর্ততায় বিঘ্ন না ঘটায়। আর সে কারণেই আইপিআরএসপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাটি দ্রুত সার-সংক্ষেপ করে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া উচিত ছিল। যে ভুলগুলো আমরা খসড়া পিআরএসপি প্রণয়নের সময় করেছিলাম সেগুলো যেন পুনরায় না করি সে জন্যেই এ কাজটি এমন জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক স্টক হোল্ডারদের সঙ্গে আলাদা কলসাল্টেশন আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন দরিদ্র (পুরুষ ও নারী), চরম দরিদ্র (পুরুষ ও নারী), অসহায় জনগোষ্ঠী, বড় ও মাঝারি কৃষক, ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষক, ভাগচাষী, শিল্প শ্রমিক (বৃহৎ ও ক্ষুদে), পরিবহন শ্রমিক (যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক), ব্যবসায়ী (বৃহৎ ও ক্ষুদে), শহর ও গ্রামের দিনমজুর, মহানগরের নির্মাণ শ্রমিক, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সমস্যা, চাহিদা, সম্ভাবনা নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে নিবিড় আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া এসব মতামত সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিচার বিশ্লেষণ করে কৌশলপত্রে উপস্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটির যাতে একটি জাতীয় মালিকানা থাকে সে জন্যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বিশেষ করে জাতীয় সংসদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। দাতারা যেহেতু এই দাবিটি করেছে তাই 'আশা' করা যায় এবারে সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে এই কৌশলপত্রটি নিয়ে আলাপ করবে। এই জায়গাটাই আমাদের দৃষ্টিতে খুবই দুঃখজনক বলে মনে হয়। এদ্দিন ধরে আমরা দাবি করে আসছিলাম যে, বিরোধী রাজনীতিকদের সঙ্গে, সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দারিদ্র্যু নিরসন কৌশলপত্র নিয়ে কথা বলুন। কিন্তু নাগরিক সমাজের এ দাবির দিকে তাকানোর সময় ছিল না সংশ্লিষ্টজনের। যেই না দাতারা দাবি করল অমনি রাজি হয়ে গেলেন তাঁরা। তাহলে যে জনগণ এদেশের মালিক তাঁদের চেয়েও কি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দাতারা? অবশ্য দাতাদের সমালোচনারও যথেষ্ট ভিত্তি ছিল। বিশেষ করে দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তাদের উদ্বেগের সঙ্গে দেশবাসীও একমত।

এমনি এক বাস্তবতায় আমাদের সুস্পষ্ট প্রত্যাশা যে, শুধুমাত্র দাতাতের সন্তুষ্টির জন্যে নয়, সত্যিকার অর্থেই পিআরএসপিকে একটি জাতীয় দলিল হিসাবে প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, এনজিও এবং নাগরিক সমাজের সকল প্রতিনিধি এবং গরিব মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার রাজনৈতিক অঙ্গীকার সরকারকে কার্যক্ষেত্রে দেখাতে হবে। তা না হলে এটি একটি সুলিখিত কাগজ হিসাবেই নীতিনির্ধারকদের শোলা বর্ধন করে চলবে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়নও সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার অধিকারকে প্রস্তাবিত কৌশলপত্রের মৌলিক বিষয় করতে হবে। তা করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর করা, ন্যায়পাল নিয়োগ করা, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, সরকারী খরচ কমিশনের প্রস্তাবাবলী দ্রুত বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে। আমাদের যা নেই সে নিয়ে হাপিত্যেস না করে আমাদের যা আছে তাকে কেন্দ্র করেই সামনের দিকে এগুতে হবে। আমাদের কৃষক ক্ষুদে উদ্যোক্তা, বস্ত্র শিল্পোদ্যোক্তা, এনজিও খাত যে সাফল্যের গাথা রচনা করেছে সেসব থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মতো করে জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে। শুধু প্রণয়ন করলেই চলবে না, এই কৌশলপত্র যাতে ঠিকঠাক বাস্তবায়িত হয় তা সর্বক্ষণ নজরদারিও করতে হবে জনগণকেই। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিআরএসপি মনিটরিংরের দায়িত্বও নাগরিক সমাজকে গ্রহণ করতে হবে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরাও সফলকাম হব— সেই ভাবটি জাতির হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে। একা সরকার যে তা করতে পারবে না সে সত্যটি মেনে নিয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে পুরো জাতিকেই একাট্টা হতে হবে। কিন্তু, সমাজকে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশুক্ত করে, শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে উদ্যোগী উন্নয়ন সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জাতিকে এক করা যাবে না। খোলা মন নিয়ে স্বদেশের কথা ভেবে সকলে একযোগে কাজ না করতে পারলে দারিদ্র্য নামের যমদূতের মার খেতেই থাকব।

## কাজান থেকে লিখছি

শাহরিয়ার কবির

# সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের অনন্য এক দৃষ্টান্ত তাতারস্তান

তাতারস্তানের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মীয় নেতারা যেভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক উদ্যোগে একে অপরকে সাহায্য করেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কাজানের পেশ ইমাম মনসুর জালিয়ালেদিনভ আর আর্চবিশপ আনাসতাসির সঙ্গে আলোচনার সময় মনে হয়েছে এঁদের জন্মানো উচিত ছিল আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও বিদ্বেষের কোন দেশে। আর্চবিশপ আনাসতাসির দফতরে কয়েকটি আলোকচিত্র এক পাশের টেবিলে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। একটি হলো তাতারস্তানের গ্রাভ মুফতি গুজমান হজরতের সঙ্গে আর্চবিশপ আনাসতাসির। আলোচনার শুরুতেই আর্চবিশপ বললেন, গ্রাভ মুফতি আমার একজন ভাল বন্ধু। প্রায়ই আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তাতারস্তানের প্রেসিডেন্ট অনেক সময় আমাদের দু'জনের সঙ্গে আলোচনা করেন। কাজানে বনেদি ধাঁচের এক দোতলা বাড়িতে আর্চবিশপের দফতর। বড় ঘরের দেয়ালজুড়ে যিশু খ্রিস্ট মেরি মাতা ও সাধু-সন্তদের তৈলচিত্র ও আইকন ঝোলানো রয়েছে। শুক্রমণ্ডিত বিরল কেশ হাসিখুশি অমায়িক চেহারার আর্চবিশপের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথমে নামের কার্ড চেয়েছি। হেসে আর্চবিশপ বললেন, আমি কার্ড ছাপিনি কারণ কাজানে সবাই আমাকে চেনে। তাঁর নাম আনাসতাসির আগে পরে কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে আবার হেসে মাথা নাড়লেন— আমাকে সবাই আনাসতাসি নামে ডাকে। আগে বড়সড় একটা নাম ছিল বটে, এখন আমি শুধু আনাসতাসি। উপপ্রধানমন্ত্রী জিলিয়া ভালিয়েভা যেমন বলেছিলেন আর্চবিশপ আনাসতাসিও বললেন, রাশিয়ার 'ইভান দি টেরিবল' তাতারস্তান দখল করার আগেও এখানে অর্থডক্স চার্চের অবস্থান ছিল, মুসলমানরা কখনও আমাদের ধর্মপ্রচারে বাধা দেয়নি। বারো শ' বছর আগে বুলগার খানাতের সময় ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম ছিল কিন্তু খ্রীস্টধর্মের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনা কখনও ঘটেনি। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বাধা এসেছে কমিউনিস্ট আমলে। তখন শুধু খ্রীস্টান নয়, মুসলমানরাও একইভাবে রাষ্ট্রীয় পীড়নের শিকার হয়েছে। গোটা তাতারস্তানে কমিউনিস্টদের আমলে মাতে বিশ্বটা প্রকাণ করেন আমলে মাত তির সংখ্যা আট। ছয়টা পুরুফদের আর দুটো নানদের জন্য।

তাঁকে বিব্রত করার জন্য বলেছিলাম, মুসলমান ও খ্রীস্টান সংখ্যা প্রায় সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও যেখানে মুসলমানদের জন্য রয়েছে তেরো শ' মসজিদ সেখানে খ্রীস্টানদের জন্য দেড় শ' গির্জা কি পরিসংখ্যানগতভাবে বৈষম্যমূলক নয়? বিনুমাত্র বিব্রত না হয়ে হেসে ফেললেন আর্চবিশপ। বললেন, মসজিদ বানানো যত সহজ, গির্জা বানানো তত সহজ নয়। এর পর ব্যাখ্যা করে বললেন, গ্রামে অনেক মুসলমান নিজের বাড়ির একটা আলাদা ঘর মসজিদ বানিয়ে ফেলতে পারে, খ্রীস্টানরা এ রকম পারে না। তাতারস্তানে এখন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার রয়েছে। রাষ্ট্রপতি মিন্তিমির শাইমিয়েভের উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন আর্চবিশপ আনাসতাসি। রাষ্ট্রপতি নিজে মুসলমান এবং তাতারস্তানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কোন ধর্মের প্রতি তার পক্ষপাত নেই। সরকারের প্রধান সব দফতর কাজান ক্রেমলিনে অবস্থিত। মস্কোর ক্রেমলিনের আগে কাজানকা নদীর তীরে এক হাজার বছর আগে বিশাল এলাকা জুড়ে ক্রেমলিন নির্মাণ করা হয়েছে। বাইরের পাঁচিল আর প্রধান ফটক ছাড়া ভেতরে পুরনো আমলের একটা মাত্র ইমারত রয়েছে, বাকি সব নতুন। তাতারস্তানের সবচেয়ে বড় মসজিদ কুল শরিফের ঠিক পাশেই রয়েছে অর্থডক্স চার্চ। দুটোই কমিউনিস্ট আমলে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর তাতারস্তানে যখন মিন্তিমির শাইমিয়েভ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন করে মসজিদ-গির্জা বানানোর অনুমতি দিলেন তখন

মুসলমানদের কেউ কেউ বলেছিল ক্রেমলিনের অর্থডক্স চার্চ বানানো হয়েছে মসজিদ ভেঙ্গে—কুল শরিফ মসজিদ গির্জার জায়গায় বানানো হোক। রাষ্ট্রপতি মিন্তিমির শাইমিয়েভ এর প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি। তিনি পাশাপাশি মসজিদ ও গির্জা বানিয়েছেন। গির্জা বানানোর কাজ শেষ হয়ে গেলেও মসজিদের কাজ এখনও কিছু বাকি আছে। এ বছরের ভিতর নির্মাণ কাজ শেষ হলে কুল শরিফ হবে ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ। তাতারস্তানের মানুষ নিজেদের গাত্রবর্ণের জন্য ইউরোপীয় মনে করে।

আর্চবিশপকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের কোন রাজনৈতিক দল আছে কিনা কিংবা অর্থডক্স খ্রীস্টানরা কোন রাজনৈতিক দল করে কিনা। এক কথায় না বলেছেন আর্চবিশপ—রাজনীতিরব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তাঁকে বলেছিলাম, পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসন অবসানের ক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পোল্যান্ডে পরিবর্তনের নায়ক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লেচ ওয়ালেসার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছি। ওয়ালেসা নিজে গোঁড়া ক্যাথলিক, বলেছেন পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্য নিয়মিত গির্জায় যেত। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন অবসানের ক্ষেত্রে গির্জা কোন ভূমিকা নিয়েছিল কিনা জানতে চেয়েছিলাম আর্চবিশপের কাছে। তিনি বললেন, রাশিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাশিয়ায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গির্জার কোন ভূমিকা ছিল না। এর পর তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমি মনে করি রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সব সময় ধর্মের বাইরে রাখা উচিত। তাঁকে বলেছি ইউরোপের বহু দেশে ক্রিশিসান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আছে। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে ইসলামের নামে রাজনৈতিক দল আছে। ভারতে হিন্দু ধর্মভিত্তিক এবং মায়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল থাকলে অর্থডক্স চার্চ কোন্ যুক্তিতে রাজনীতির বিরোধিতা করে? আর্চবিশপ আনাসতাসি বললেন, অর্থডক্স চার্চের অনুসারীরা যে কোন রাজনৈতিক দল সমর্থন করতে পারে। আমরা অতীতে দেখেছি, চার্চ যখনই রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করেছে তখনই বিভিন্ন দেশে ও সমাজের ভেতর যুদ্ধ ও হানাহানি হয়েছে।

এর পর তাঁকে বলেছি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া সর্ব্র কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের জন্য খ্রীস্টান ও মুসলিম ধর্মীয় নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাশিয়ায় তখন আপনারা কী করেছেন? আর্চবিশপ বললেন, আমরা শুধু প্রার্থনা করেছি। তাঁকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশে খ্রীস্টান এনজিওগুলোর কথা বলেছি। বিশেষভাবে ক্যাথলিকরা ধর্ম প্রচার ছাড়াও এসব দেশে শিক্ষার প্রসার, দারিদ্যু দ্রীকরণ, চিকিৎসা ও সমাজসেবার বহু ক্ষেত্রে কাজ করছে। অর্থডেব্র চার্চের এ ধরনের কোন কর্মসূচী নেই কেন এ বিষয়েও প্রশ্ন করেছি তাতারস্তানের আর্চবিশপকে। তিনি বলেছেন, ক্যাথলিকদের একটি আলাদা রাষ্ট্র আছে, প্রচুর সম্পদ আছে। আমাদের যা কিছু সম্পদ ছিল বলশেভিকরা সব বাজেয়াফত করেছে। আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করাই এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতারস্তানে গির্জা বানাবার জন্য অনেক সময় আমরা মুসলমানদের সাহায্য নিয়েছি। আমাদের একটি সেমিনারিতে ৭৫ ছাত্রকে ক্যাথলিকরা মাথাপিছু ২০০ ডলার করে বৃত্তি দেয়। আমরা এখন সাধারণ মানুষের চাঁদায় চলছি। খ্রীস্টান-মুসলমান ধর্মীয় সৌহার্দ্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে আর্চবিশপ আনাসতাসি জানালেন, গত বছর তিনি ও ডেপুটি মুফতি ওয়ালিউল্লাহ হজরত এক সঙ্গে জেরুজালেম ঘুরে এসেছেন। রাশিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকার কারণে তাতারস্তানের মুসলমানদের জেরুজালেম যেতে কোন বাধা নেই। ইসরাইলীরা তাতারস্তানের মুসলমান ও খ্রীস্টান দুই ধর্মীয় নেতাকেই জেরুজালেমে স্বাগত জানিয়েছে। কাজানের পেশ ইমাম মনসুর জালিয়ালেদিনভের বয়স ৪৪ হলেও মনে হয় ত্রিশের কোঠায়। তাতারস্তানের মুসলমান ও খ্রীস্টান দুই ধর্মীয় নেতাকেই জেরুজালেমে মাত্র একটা মসজিদ ছিল, এখন কাজানে তেরোটা মসজিদ। সারা দেশে তেরো শৈ রেজিস্টার্ড মসজিদ আছে, এর বাইরে পারিবারিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মসজিদও আছে। '৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রিলিজিয়াস বোর্ড অব মুসলিম। তাতারস্তানের সব ইমাম মিলে মুফতি নির্বাচন করেন। আল মারযানি মসজিদের ইমাম মনসুর আরও জানালেন, কমিউনিস্ট আমলে গোটা রাশিয়া থেকে চৌদ্পনেরের সহযোগিতায় হজ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

### ওয়াশিংটন থেকে

#### হারুন চৌধুরী

#### তেড়ে আসছে সাফিডা

কিছুদিন যাবত টিভিতে ও পত্রপত্রিকায় সাফিডা সম্পর্কে জোর প্রচারনা চলছে। সাফিডা কি! বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায়, সাফিডা এক প্রকার বড় ধরনের পোকা। পঙ্গপালের মতো এর উৎপত্তি। গাছের পাতা থেকে ক্ষেতের ফসল সব কিছুই খেয়ে সাবাড় করে দেয়। তবে পঙ্গপালের মতো উড়তে পারে না। মাটির নিচ থেকে বেয়ে বেয়ে উঠে আসে গাছের ডালে, বাড়ির দেয়ালে, রাস্তাঘাটে। একটা নয় দুটো নয় লক্ষ লক্ষ। গবেষকদের মতে, সতেরো বছর আগে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে এই সাফিডার আবির্ভাব হয়েছিল। মাটির নিচে এর ডিম সুপ্ত অবস্থায় থেকে সতেরো বছর পর আবার আমেরিকায় তেড়ে আসছে। ভার্জিনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এখন সাফিডাকে দেখা যাচ্ছে। আগের ন্যায় এখনও তেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি। যুগে যুগে পৃথিবী বদলাচ্ছে। হয়ত রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরিবেশ দূষণের কারণে সাফিডার ডিম ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপরও আমেরিকানরা সাফিডার মুখ দেখতে চায়।

#### আমেরিকায় নির্বাচন ৷ সাধারণের ধারণা কারচুপি হবে

আমেরিকার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষও ভোটে কারচুপি হবে বলে সন্দেহ পোষণ করছে। গত ২০ মে লেরি কিং লাইভ বিখ্যাত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে নির্বাচিত প্রার্থী জন কেরি ভোটে জয়ী হলেও পূর্বের ন্যায় জর্জ বুশের ভাই ফ্লোরিডার গবর্নর তাঁকে জিতিয়ে দেবে। অনেকের মতে, কম্পিউটার মেশিনে 'হ্যা' অথবা 'না' থাকলে কি হবে! 'না' বোতামে চাপ দিলেও সেই ভোট জর্জ বুশের 'হ্যা'তে গিয়ে যুক্ত হবে। এবারের নির্বাচনে মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। ইরাক যুদ্ধের পর মানুষ ভেবেছিল পেট্রোলের দাম কমবে। এখন তারা উল্টো ফল দেখতে পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি গ্যালন পেট্রোলের মূল্য দুই ডলারের ওপরে। আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। আগামী ৫ জুন সচেতন নাগরিকরা হোয়াইট হাউসের সামনে এক বিশাল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছে। জনমত জরীপে জন কেরি এগিয়ে থাকলেও জর্জ বুশ কারচুপি করে জিততে পারে। তবে জন কেরি প্রেসিডেন্ট হলে পৃথিবীতে শাান্তি আসবে এটাই একমাত্র ভরসা।

#### আসনু ফোবানা সম্মেলন একত্রীকরণ আকাঙ্কা

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সেপ্টেম্বর মাসে দুটো ফোবানা সম্মেলন হবে ওয়াশিংটন ডিসিতে ও লসএ্যাঞ্জেলসে। এক সময় সকল বাংলাদেশীর মিলনমেলা ছিল এই ফোবানা। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সেমিনার করে সরকারকে রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দেয়া ফোবানার আসল উদ্দেশ্য। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা সংক্ষেপে ফোবানা নাম দিয়ে এর যাত্রাপথ আরম্ভ হয় আজ থেকে সতেরো বছর অগে ১৯৮৭ সালে এই ওয়াশিংটন ডিসিতে। ফোবানার সুফল যখন প্রবাসে ও দেশের মানুষের কাছে পৌছতে থাকে তখনই একশ্রেণীর মানুষ নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে থাকে। ফলে ফোবানা ১৯৯৭ সালে বিভক্ত হয়ে যায়। এর পর অনেক চেষ্টা-তদ্বির করেও ফোবানাকে একত্রিকরণ করা সম্ভব হয়নি। কোন্দলের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ফোবানা সম্পর্কে হতাশার সৃষ্টি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বিচ্যুত আজ ফোবানা। এখন সম্মেলনে প্রধান অতিথি করে আনা হয় বিতর্কিত ব্যক্তিদের। লক্ষ ডলার খরচ করলে কি হবে? ফোবানার আসল উদ্দেশ্যই এখন ভেস্তে গেছে।

#### লোকসভা নির্বাচন-২০০৪

সরদার আমজাদ হোসেন

## ভারতীয় রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক পুনর্পত্যাবর্তন

ভারত শুধু একটি দেশ নয়, এশিয়া মহাদেশে ভারত এক বিশিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান জুড়ে রয়েছে। ভারতের বহুত্বাদ, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মবিশ্বাস ও চেতনার মধ্যে, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে অর্ধশতান্দীর বেশি সময় জাতীয় ঐক্য, সংহতি, ভারতীয় মূল্যবোধের পতাকা সারা বিশ্বে উড্ডীন রেখেছে, তা নিঃসন্দেহে অবিশ্বরণীয়। ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-সংঘর্ষ এমনকি সহিংসতা ভারতীয় গণতন্ত্র, ভারতীয় পার্লামেন্ট, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকারের অগ্রযাত্রাকে বাধা দিতে পারেনি। অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ইস্যু, গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বহুজাতিক রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সাময়িকভাবে আড়াল করেছে, কিন্তু ঢেকে দিতে পারেনি। কালো মেঘের আড়াল থেকে বিদ্যুতের ঝলকের মতো মৌলবাদী হিন্দুত্বোদের আদর্শ ভেদ করে ধর্মনিরপেক্ষতার, উদার মানবতাবাদ এবং আধুনিক রাষ্ট্রের দূরদৃষ্টি নিয়েই বিজয়কেতন উড়িয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের কোটি কোটি মানুষ সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যাখ্যান করেছে। জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে সরকারী উদ্যোগে গৃহীত অপপ্রচার চালানোর জন্য চয়ন করা ভোটারদের মন ভোলানো শন্ধ-সম্ভার। শাইনিং ইন্ডিয়া, উদয়যাত্রা, ফিলগুড, বিদেশিনী ইস্যু বা ফরেন অরিজিন, হিন্দুত্ববাদ ভারতীয় ভোটারদের মন গলাতে পারেনি। এমনি প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের শুভ সূচনা, ক্রিকেট ডিপ্লোম্যাসি এবং ভারতের গ্রোথ রেট ৮%-এর ওপর, কৃষিক্ষেত্রে আবাদের অবস্থার উনুতি যেন ভারতীয় গ্রামীণ জনপদের মতামতের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

#### এক বর্ণাত্য নির্বাচন

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের এক বর্ণাঢ্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো পাঁচ পর্যায়ে ২০, ২২, ২৬ এপ্রিল এবং ৫ ও ১০ মে। ভারতবর্ষজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের আবেগ-উত্তেজনা, প্রত্যাশা, বিজয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিরামহীন যাত্রা এপ্রিল-মে মাসের প্রচণ্ড দাবদাহ কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এনডিএ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর আশি ছুঁই ছুঁই (৭৯) বয়স বা ঐতিহ্যবাহী গান্ধী পরিবারের বধূ সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পত্নী সোনিয়া গান্ধী বা কংগ্রেসের নবপ্রজন্মের আশার আলো রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ক্লান্তিহীন পরিশ্রম ছিল দারুণভাবে লক্ষণীয়। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, রাজপুতানার মরুভূমির তপ্ত বালুঝড় তাঁদের গতি রোধ করতে পারেনি। ১০০ কোটি মানুষের দেশ, ৬২ কোটি ভোটার, ২৬ রাজ্য, চার মাসব্যাপী এক বিশাল বহর নিয়ে প্রধান দু'টি দল এবং জোট আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী বিস্তৃত নির্বাচনী এলাকা সফর করেছেন। এক জোট প্রচণ্ড শক্তির দাপট নিয়ে প্রচার করেছে মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদ, আরেক দল প্রচার করেছে উদার মানবতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা। রাজনীতিতে উদীয়মান তারকা রাহুল গান্ধী, ভারতীয় জনগণের অঘোষিত নন্দিত 'রাজকুমারী' প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী প্রচারণা এক নতুন দ্যুতি সৃষ্টি করেছে অযোধ্যার আমেথি এবং রায়বেরিলি নির্বাচনী এলাকায়। এ দু'টি সিট সোনিয়া গান্ধী ও তদীয় পুত্র রাহুল গান্ধী– কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। 'দি নিউ টেকনিশিয়ান ইন দি কংগ্রেস ওয়ার রুম' বলে পরিচিত রাহুল গান্ধীর 'গরিব কি সাথ', 'আম আদমি' স্লোগান দু'টি ভোটাররা লুফে নেয়। নির্বাচনী প্রচারণায় অঢেল অর্থ ব্যয়ে বিজেপি নানা অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ নির্বাচনী প্রার্থনা আয়োজন করে। লালকৃষ্ণ আদভানির উদয়যাত্রা, বাস বোঝাই শিখ আনা, পাকিস্তান থেকে সেরওয়ানী পাজামা আমদানি, ধূতি ছেড়ে বাজপেয়ীর শেরওয়ানী চোস্তা পরা, এ সবই ছিল নির্বাচনে প্রচারের অংশ। ভারতীয় নির্বাচনে জয়ের জন্য বিজেপি ইউপিতে দুই লাখ মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা, এমনকি দিল্লী জামে মসজিদের ইমামকে মুসলমান ভোটারদের পক্ষে টানার কৌশল হিসাবে প্রচারণায় নামানো এবং গুজরাটে যা ঘটেছিল তা আর কোন দিন পুনরাবৃত্তি হবে না বলে প্রচারণা চালিয়েছিল। বিধি বাম তিনি আর ফিরলেন না ক্ষমতায়। ভারতীয় রাজনীতির গ্লামারাস প্রচারণার দু-একটি নমুনা তুলে ধরা প্রয়োজন। নির্বাচনী শোভাযাত্রার বিশালতা, আড়ম্বর, শোভাযাত্রা কেমন হতে পারে? একটি উদাহরণ অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্র বাবু নাইডুর শোভাযাত্রা। ১০ লাখের বেশি লোক নিয়ে প্রচারণা শুরু। ১১ হাজার বাস, ১৫ হাজার ট্রাক, ২৪ বিশেষ ট্রেন, ৭ হাজার ৫০০শ' কারযোগে এই মিছিলটি পৌঁছে হায়দরাবাদে। বিজেপি 'ঢুনাইয়া মহাসংগ্রাম' নির্বাচনী মহাসংগ্রাম দিবস পালন করে। এক হিসাবে জনকণ্ঠের বিশেষ সংবাদদাতার তথ্য মতে, প্রতিটি দলের গড়ে ৩ জন করে প্রার্থী ধরলে ২৫ লাখ রুপী হিসাবে ৮ হাজার ৮২১ কোটি, পরিবহন ৬৫০ কোটি, বিমান-হেলিকস্টার ১০০ কোটি, ব্যানার, ফেস্টুন, পতাকা, সাইন বোর্ড ৬৫০ কোটি, জনসভায় ব্যয় ৩০০ কোটি, বিজ্ঞাপনী ব্যয় এক হাজার ১৫১ কোটি। সব মিলিয়ে ১১ হাজার ৫৬২ কোটি রুপী। এলকে আদভানির উদয়যাত্রার জবাব দিতে কংগ্রেস রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কাকে পদযাত্রায় নামিয়েছেন। ভারতীয় নির্বাচনের বিশাল কর্মকাণ্ড এবং দেশব্যাপী উত্তেজনা উদ্বেগের মধ্যে নীরব ছিল ভারতীয় ভোটাররা বিশেষ করে গ্রামের সাধারণ মানুষ। যাঁদের আত্মা ডুব দিয়েছিল ভারতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীতে। বিশাল ভারতের ঐক্যে। যেখানে জাতি-ধর্ম,বর্ণ-সমাজ নির্বিশেষে এক সঙ্গে বাস করবে। জরিপকারী, পূর্ব গণনাকারী, মিডিয়া, এ্যানালিস্টরা ভারতীয় ভোটারদের মনের গভীরে ডুব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই পরাজয়ের পর সুষমা স্বরাজ বলেন, 'শুধু আমরা নই, মিডিয়াও হেরেছে।' (অসমাপ্ত)